ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 04. No. 01. August 2010

বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন (১৯৯১-২০০১): একটি মূল্যায়ন

মো: সুলতান মাহমুদ*

Abstract : The focus of this paper is on the nature and problems of political development in Bangladesh that have been used to limit from 1991 through 2001. Now Bangladesh is in deep political crisis. It is evident from the findings that political institutions in Bangladesh are fragile in absence of democratic political culture. The main purpose of this paper is to examine the problems of political development in Bangladesh in light of the crises of governance. The theoretical framework has been discussed in this article. However, the major emphasis is on understanding the problems of political development in Bangladesh concretely in light of the theory. Lastly I have suggested some recommendations for the political development in Bangladesh.

ভূমিকা

বর্তমানে যেকোনো সরকার ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার হলো রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধন করা। তবে এ কথা সত্য যে, রাজনৈতিক উন্নয়ন হঠাৎ করে প্রতিষ্ঠিত হয় না, এটা নির্মাণ করতে হয়, অর্জন করতে হয়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য পাকিস্ড়ান সৃষ্টির পর থেকেই এ অঞ্চলের মানুষ বারবার আন্দোলন সংগ্রাম করতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ একটি সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পক্ষে রায় দেয়। জনগণের এই রায় মেনে নেয়ার ব্যাপারে তদানীন্ড়ন পাক সামরিক সরকারের অনীহাই মুক্তিযুদ্ধ শুর" করার তাৎক্ষণিক কারণ ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে পশ্চিমা পদ্ধতির সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছাচারমুক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার যাত্রা শুর" হয়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরিহার করে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে। দীর্ঘদিন যে দলটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে সেই দলটি শুধু গণতন্ত্রকে রক্ষা করতেই ব্যর্থ হয়নি

* প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বরং তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিজের হাতে সেই বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরিহার করে একদলীয় ব্যবস্থা বাস্ড়বায়নের প্রয়াস চালায়। ১৫ আগষ্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্যদিয়ে দেশে সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে দু'জন সামরিক শাসক যথাক্রমে জিয়াউর রহমান (১৯৭৫-১৯৮১) এবং হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ (১৯৮২-১৯৯০) রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সংবিধান সংশোধনীর সর্বাত্মক সুযোগ গ্রহণ করে দেশে এককেন্দ্রিক স্বৈরাচারী শাসনের ধারা অব্যাহত রাখেন। ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ দিনের স্বৈরশাসনের অবসানের পর ১৯৯১ সালে সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে পুণরায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় যা রাজনৈতিক উন্নয়নের পথকে ত্বরান্বিত করে। তবে এ কথা বলা যায় না যে এখন পর্যন্ড় দেশে চুড়ান্ড়ভাবে রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। যদিও ১৯৯০ পরবর্তী নির্বাচিত সরকারগুলো তাদের ক্ষমতার মেয়াদ পূর্ণ করার পর (১৯৯১-১৯৯৬, ১৯৯৬-২০০১, ২০০১-২০০৬, ২০০৯-বর্তমান) নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতার হাতবদল হয়েছে, কিন্তু রাজনৈতিক উন্নয়নের শর্তগুলোর নাজুক অবস্থার কারণে রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস হলো, সবকিছু পেয়ে হারানোর এবং হারিয়ে প্রাপ্তির দ্বারপ্রান্ড়ে উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে দাড়ানোর। চূড়ান্ড় প্রাপ্তি বলতে যা বুঝায় তা থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের অবস্থান এখনও অনেক দূরে। প্রবন্ধটিতে ১৯৯১-২০০১ সাল পর্যন্ড় বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে এবং রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে কি কি প্রতিবন্ধকতা কাজ করেছে তা উদ্ঘাটন করার প্রয়াস চালানো হবে। এই প্রবন্ধটি সম্পাদনের জন্য দুটি গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যথা: ১. পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি; ২. ঐতিহাসিক পদ্ধতি। এখানে মূলত প্রাথমিক উৎস এবং মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তাত্ত্বিক কাঠামো

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর আবির্ভাব রাজনৈতিক বিশেণ্ডষণে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগ থেকে J. S. Coleman, Howard Riggs, Leonard Binder, Herbert Feith, Lucian W. Pye, Myron Weiner, David Apter প্রমুখ রাজনীতি বিশেণ্ডষক পাশ্চাত্য রাজনৈতিক উন্নয়নকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনৈতিক উন্নয়ন যাচাই করতে শুর" করেন। এজন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয়েছিল রাজনৈতিক উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করে একটি মানদ" দাড় করানো, যার ভিত্তিতে অন্যান্য ব্যবস্থাকে তুলনা করে দেখা যে, এসব দেশে কতটুকু রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। অনেক মনীষী রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং আধুনিকীকরণকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। Keneth Organski তার "The Stages of Political Development" এ রাজনৈতিক উন্নয়নের চারটি স্ড়র উলেণ্ডখ করেছেন। যথা- ১. রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে সকল

ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্য রাজনৈতিক একত্রীকরণ; ২. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন; ৩. জাতীয় কল্যাণ আনয়ন যেখানে জনগণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুফল ভোগ করতে পারে; ৪. জনগণের বস্তুগত জীবনমান উন্নয়ন।[১]

রাজনৈতিক উন্নয়নের এই ধারণায় আধুনিকীকরণ এবং রাজনৈতিক উন্নয়নকে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আধুনিকীকরণ রাজনৈতিক উন্নয়ন সহায়ক শক্তি হলেও তা রাজনৈতিক উন্নয়ন নয়। কারণ রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রধানত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানাদির সাথে সম্পর্কিত। এজন্য কোন সমাজ আধুনিক হলেও সেখানে রাজনৈতিক উন্নয়ন নাও হতে পারে। Lucian W. Pye তাঁর "Political Culture and Political Development" নামক গ্রন্থে রাজনৈতিক উন্নয়নের তিনটি বৈশিষ্ট্য উলেণ্ঢখ করেছেন। যথা- ১. জনগণ কেবল কর্তৃপক্ষের আদেশই মান্য করবে না বরং সক্রিয়ভাবে নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করবে। এভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাম্যনীতি প্রবর্তিত হবে; ২. রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এরূপ সামর্থ্য থাকবে যাতে জনগণের কার্যাদি কলহ মীমাংসা এবং চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়; ৩. রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারী প্রকৃতির প্রতিষ্ঠানসমূহের কাঠামোগত স্বতন্ত্রীকরণ, কার্যগত বিশেষীকরণ এবং সংহতি থাকবে।[২]

S.M. Lipset এর মতে যে দেশে শিল্পায়নের মাত্রা উচু শহরাঞ্চলের বসবাসকারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা ও শিক্ষার হার উলেণ্ঢখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেদেশে গণতন্ত্রের সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেশী।[৩] রাজনৈতিক উন্নয়ন ধারণার অগ্রপথিক Lucian W. Pye রাজনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর অবতারণা করেছেন।[৪] ১. রাজনৈতিক উন্নয়ন অর্থনৈতিক উন্নয়নের রাজনৈতিক পূর্বশর্ত;২. রাজনৈতিক উন্নয়ন শিল্পায়িত সমাজগুলোর অনুরূপ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ; ৩. রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ; ৪. রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো জাতীয় রাষ্ট্রের কার্যকারিতা; ৫. রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো শাসনবিভাগীয় ও আইনগত অগ্রগতি; ৬. রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো জনগণের সচেতন অংশগ্রহণ; ৭. রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ; ৮. রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো স্থিতিশীলতা ও সুশৃঙ্খল পরিবর্তন; ৯. রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো ক্ষমতা ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ; এবং ১০. রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো সামাজিক পরিবর্তনের একটি দিক।

Almond and Powell রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বলেন-Political development is increased secularization of political culture the significance of such development is in general to increase the effectiveness and efficiency of performance of the political system to increase its capabilities.[৫] তাঁরা রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে আরো বলেন "Political Development has been defined as the increased

differentiation and specialization of political structures and the increased secularization of Political culture."[৬]

Howard Riggs রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিবেশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, The term 'Development ' in the Political context be confined to connote an increasing ability to make and carry but collective decisions affecting the environment (not the context).[৭]

রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি সাবলীল সুন্দর সংজ্ঞা প্রদানের নিমিত্তে G.A. Almond এর অনুপ্রেরণায় Committee on Comparative Politics of International Social Science Research Council প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। এই কমিটির মতে রাজনৈতিক উন্নয়ন হলো- "A continuous interaction among the process of structural differentiation, the imperatives of equality and the integrative, responsive and adaptive capacity of a political system.[৮]

ক্লড ওয়েলস (Claud Welch) তার সম্পাদিত *Political Modernization* গ্রন্থে রাজনৈতিক উন্নয়নকে (তাঁর ভাষায় রাজনৈতিক আধুনিকীকরণ) নিম্নোক্ত তিনটি কার্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। যথা- ১. রাষ্ট্রে ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ এবং যে সালে গতানুগতিক কর্তৃত্বের উৎসগুলোর ক্ষয়প্রাপ্তি; ২. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণ; এবং ৩. রাজনীতিতে জনগনের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণ এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে ব্যক্তিবর্গের অধিকতর একাত্মতা পোষন।[৯]

David Apter তার Rethinking Development গ্রন্থে রাজনৈতিক উন্নয়নকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে-"Political development denotes regimes, state systems and Political systems whose institutional Functions involving along with development equity will require quarter participation and elite accgentiblity."[১০]

একজন ভারতীয় বিশেণ্ঢষক[১১] একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে নাকি অবক্ষয় হচ্ছে তা নিরূপণের নিমিত্তে কিছু নির্দেশকের উলেণ্ঢখ করেছেন। যথা- ১. রাষ্ট্রগঠন বা ভূখণ্ডগত সংহতি; জাতিগঠন বা জাতীয় সংহতি; ২. জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নিবাচন ব্যবস্থা; ৩. রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ; ৪. সিদ্ধান্ড় গ্রহণে জন অংশগ্রহণ; ৫. স্বাধীন গোষ্ঠীসমূহের মাধ্যমে স্বার্থ উত্থাপন; ৬. উত্থিত স্বার্থসমূহ স্থায়ী রাজনৈতিক দলসমূহের মাধ্যমে একত্রীকরণ যা গণতান্ত্রিক চরিত্রের অংশ; ৭. সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমগুলোর স্বাধীনতা; ৮. রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ; ৯. স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সরকার ব্যবহার পূর্ণ স্বাধীনতা; ১০. শিক্ষা কার্যক্রমের বিকাশ সাধন; ১১. প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নির্বাচনী এলাকায় সেবা প্রদান এবং আইনসভার কার্যকরী ভূমিকা; ১২. সরকারি প্রতিশ্রুতি বাস্ড়বায়নে সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ; ১৩. সরকারি কর্মকর্তা ও

কর্মচারীদের কাজের ওপর দেখাশুনা বা তদারকি করার দায়িত্ব থাকবে ন্যায়পালের মত শক্তিশালী সংগঠন সমূহের হাতে; ১৪ তাৎক্ষণিক আন্দোলন এবং মতদ্বৈততা সহ্য করার মানসিকতা থাকবে কর্তৃপক্ষের; ১৫. রাজনৈতিক এলিটদের সামাজিক ভিত্তির প্রসার; ১৬. সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং জনগণের নিকট তাদের কাজের দায়বদ্ধতা; ১৭. বিচারবিভাগের স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনের অস্ড়িত্ব; ১৮. সশস্ত্র বাহিনীর রাজনীতি বিমুখ চরিত্র; ১৯. সাংবিধানিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ঐক্যমত্যের রাজনীতি; ২০. সরকারিদলের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা; এবং ২১. রাজনৈতিক কৃষ্টির চর্চা বা ইহাজাগতিকরণ।

রাজনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণাগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশেণ্ডষণের পর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়। বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১. অংশগ্রহণমূলক নাগরিক সমাজ সৃষ্টি করা।
২. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা;
৩. একটি সক্ষম শাসকগোষ্ঠী সৃষ্টি করা যারা দেশের জনগণের কাছে তাদের কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।
৪. সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকারিতা সৃষ্টি করা যাতে করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা লক্ষ্য করা যায়।

অংশগ্রহণমূলক নাগরিক সমাজ সৃষ্টি ও রাজনৈতিক উন্নয়ন

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করে থাকে যা রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।[১২] তবে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় জনগণের মতামত প্রকাশের সুযোগ ঠিকমত প্রস্ফুটিত হয়না, যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা রাজনৈতিক উন্নয়ন বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা হিসেবে কাজ করে। অগণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্য নামমাত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকলেও তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বৈধতা পায় না। এ ধরনের সরকার ব্যবস্থায় রাজনৈতিক উন্নয়নের চেতনার অবক্ষয় ঘটে। এর ফলে একদিকে যেমন জনগণ এবং বিরোধীদলগুলো একটি খারাপ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়, তেমনি অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দল বা সরকার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য টিকে থাকার সুযোগ পায়। কিন্তু একটি জাতির রাজনৈতিক উন্নয়ন, তার সরকার ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল পরিবর্তন এবং সামগ্রিকভাবে জাতির গণতান্ত্রিক বিকাশকে অব্যাহত রাখার জন্য মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন একটি বৈধ ও উপযুক্ত পথ হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সকল বিষয়গুলোকে মূল্যায়ণ করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ প্রক্রিয়া একটি গুর"ত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে, যার দ্বারা ক্ষমতার পট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক উন্নয়নের একটি মসৃণ পথ তৈরি করা যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্ড়সমূহ জনগণের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু সেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা যদি অগণতান্ত্রিক হয় তাহলে সেখানে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ড়সহ বিভিন্নমুখী প্রতিবন্ধকতা,

অনিশ্চয়তা, হুমকি, বিভ্রান্ড়িকর তথ্য এবং গুজব ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার সুযোগ থাকে। প্রকৃতপক্ষে একথা বলা যেতে পারে যে,গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা রাজনৈতিক উন্নয়নকে মূল্যায়ন করার একটি সুশৃঙ্খল পন্থা হলো অংশগ্রহণ। আর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের অন্যতম প্রধান পথ হলো নির্বাচন। এই প্রক্রিয়ায় জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় যা রাজনৈতিক উন্নয়নকে আরো সুসংহত করে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বিগত ৩৮ বছরে মোট ৯টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ৩টি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ৩টি গণভোট এবং কয়েকটি স্থানীয় সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিটি নির্বাচনই প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হলেও ১৯৯১ সালের পূর্ব পর্যন্ড় অনুষ্ঠিত অধিকাংশ নির্বাচন বেসামরিক ও সামরিক সরকারের প্রভাবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে পারেনি। কারণ উক্ত সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার নিজেদের ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নির্বাচনী অনিয়ম ও দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। এবং এই প্রক্রিয়া রাজনৈতিক উন্নয়নকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

এরশাদ সরকারের পতনের পর বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং রেকর্ড সংখ্যক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।[১৩] সন্ত্রাস, যা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটা অঙ্গে পরিণত হয়েছিল, এই নির্বাচনে তা অনেকটা অনুপস্থিত ছিল। শেষ মুহূর্তের প্রচারাভিযানে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো লক্ষণীয় সহনীয়তার পরিচয় দেয়। ফলে নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি বিশেষ করে মহিলা ভোটারদের অংশগ্রহণ ছিল সন্ড়োষজনক এবং স্বতঃস্ফূর্ত। বেশ কয়েক বছর পরে ভোটাররা প্রথম কোন প্রকার ভয়ভীতি ছাড়াই তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। আগের নির্বাচনগুলোর সাথে তুলনা করলে এটিকে 'অনন্য' নির্বাচন বলতে হয়। দেশ-বিদেশের পর্যবেক্ষকদের মতে, এটি ছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা তথা রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে এবং অগ্রসর দেশসমূহের জন্য একটি আদর্শ নির্বাচন।[১৪] ১৯৯১ সালের নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে।[১৫] বিএনপি সরকারের অধীনে যে উপ-নির্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত হয় তাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংকট তীব্র হয়। এই সংকটের মধ্যেই ১৫ ফেব্র"য়ারি ১৯৯৬ বিএনপি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণ ছাড়াই ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করলে সংকট আরো তীব্র আকার ধারণ করে। দেশব্যাপী হরতাল ও সহিংসতার ভয়ে ভোটাররা ঘরের বাইরে বের হয়নি। সব মিলে ১০% এর মতো ভোট পড়েছিল বলে অনুমান করা হয়।[১৬] অতীতে নির্বাচনের সংক্রান্ড় যে দুর্নীতির বির"দ্ধে বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আন্দোলন করেছিল ঐ নির্বাচনে বিএনপি'র কর্মীরা সেই কাজ করে। বিএনপি এই নির্বাচনকে খুবই সুষ্ঠু ও অবাধ হিসেবে চালানোর চেষ্টা করলেও বিরোধীদলগুলো এই নির্বাচনকে অবৈধ ও বেআইনি বলে আখ্যায়িত করে।[১৭] বিরোধীদলগুলো সরকারের বৈধতা মেনে না নিলেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান (ত্রয়োদশ সংশোধনী) মেনে নেয়। এই

বিধান অনুসারে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয় এবং এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে মোট ভোটারের ৭৪.১৫% ভোটার ভোট দেয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৭.৪৪% ভোটসহ ১৪৬টি আসন এবং বিএনপি ৩৩.৬১% ভোট সহ ১১৬টি আসন লাভ করে।[১৮] কয়েকটি স্থানে সামান্য কিছু অসুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা বাদ দিলে সর্বোপরি নির্বাচন গ্রহণযোগ্য ছিল। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল পর্যাপ্ত এবং ভোট গণনা ছিল যথাযথ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক দলসমূহ আচরণবিধি মেনে চলেছিল। স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। সর্বোপরি একটি নতুন সরকার গঠিত হয়। ১ অক্টোবর ২০০১ অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এদেশের নির্বাচন রাজনীতির ইতিহাসে একটি মাইলফলক। এই নির্বাচটিও অনুষ্ঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। এ নির্বাচন ছিল তুলনামূলকভাবে নিরপেক্ষ ও তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। এই নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট ২১৪টি আসন পেয়ে বিজয় লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। অন্যদিকে ৬২টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয়নি এবং বিএনপির বিরুদ্ধে স্থূল কারচুপির অভিযোগ করে।[১৯]

বাংলাদেশের নির্বাচনের গুণগত দিক বিশেণ্ডষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ নির্বাচনগুলোই শাসকরা তাদের ক্ষমতাকে বৈধ ও কুক্ষীগত করার জন্য নিজেদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত করেছে, যেটাকে হান্টিংটন 'শাসক প্রদত্ত' (Rulers Sponsored) নির্বাচন বলে অভিহিত করেছেন। জনগণের সম্মতি ও পছন্দ যাচাই করা এসব নির্বাচনের উদ্দেশ্য ছিল না। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনেই শাসক দল নির্বাচনের ফলাফলের ওপর নিজেদের একক প্রাধান্য বজায় রেখেছে। এজন্য কারচুপি করেছে এবং সরকারি দলকে বিপুলভাবে বিজয়ী করেছে। নির্বাচনে কারচুপি বাংলাদেশের নির্বাচনী সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সন্ত্রাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে নির্বাচনকে পরিণত করেছে মাস্তানি ও মাফিয়াদের উৎসবে। বাংলাদেশের নির্বাচন খুব কম ক্ষেত্রেই জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করেছে এবং নির্বাচনের সুষ্ঠুতা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে যা এলিটদের বিভক্ত করেছে। অথচ রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করার জন্য কার্যের নিয়মনীতির ব্যাপারে প্রক্রিয়াগত সম্মতি (Procedural consensas on the rules of the game) প্রয়োজন। প্রতিটি নির্বাচনেই ভোটারের অংশগ্রহণ মোট ভোটারের প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ অর্ধেক ভোটারকেই নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় আনা সম্ভব হয়নি। নির্বাচনে কারচুপির ফলে তাতে জনগণের মতামতের প্রতিফলন কম ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কাজেই ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হিসেবে নির্বাচনের ওপর জনগণের পূর্ণ আস্থার অভাব সৃষ্টি হয়েছে। এসব পরিস্থিতি মূল্যায়ন সাপেক্ষে বলা যায় যে, রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে রাজনৈতিক অংশগ্রহণ যথাযথভাবে পরিপূর্ণ হয়নি।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও রাজনৈতিক উন্নয়ন

সুষ্ঠু রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা একান্ত অপরিহার্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে

রাজনৈতিক দল মতাদর্শগত এবং কর্মসূচিগত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি জনগোষ্ঠী যা নিজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে মতাদর্শ ও কর্মসূচি রূপায়নের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার ভার গ্রহণ করার জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালায়। দলের সদস্যরা একই আদর্শ ও নীতিমালায় বিশ্বাসী এবং নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন করে দলের কর্মসূচিকে এবং জাতীয় স্বার্থকে বাস্তবায়িত করে। বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন ব্যতীত সরকার পরিবর্তনের জন্য অন্য কোন শান্তিপূর্ণ বিকল্প নেই। রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই জনমত সংগঠিত হয় যার ফলে সরকারি নীতি প্রভাবান্বিত হয়। তাই আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে J.H. Corry and J.E. Hodgetts বলেন, রাজনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সরকার পরিবর্তন সম্ভব করে। সরকার পরিবর্তনের উপায় হিসেবে সশস্ত্র সামরিক অভ্যুত্থানকে আর এই ধরনের সামরিক অভ্যুত্থান রোধকল্পে বল প্রয়োগ ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে শাসন করার পাল্টা প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করে।[২০]

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দল সরকার গঠন করে এবং আইনসভার সমর্থনের ওপর সরকারের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। সেজন্য ক্ষমতাসীন দলকে অত্যন্ত সতর্কভাবে কাজ চালিয়ে যেতে হয়। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যদের সমষ্ঠিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকতে হয় এবং তাদের কার্যাবলির জন্য আইনসভায় জবাবদিহি করতে হয়।[২১] এই ব্যবস্থায় এক বা একাধিক বিরোধী রাজনৈতিক দল থাকে। এই বিরোধীদল সরকারি যন্ত্রেরই একটি অংশ হিসেবে পরিচিত ও স্বীকৃত। সংসদীয় গণতন্ত্র ফলপ্রসূ করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিরোধী দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের শাসনকে মেনে নিতে হয় তেমনি সরকারি দলেরও উচিত বিরোধী দলের সমালোচনাকে স্বীকার করা। বিরোধী দলের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে Harrold J.Laski বলেন, "The oppositon spends his time in revealing the defacts of the government programme."[২২] জনগণের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পর সরকারি দলের যেমন অধিকার আছে তেমনি বিরোধী দলেরও বিরোধিতা করার অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের সংযত, পরিশীলিত এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালনের মাধ্যমে রাজনৈতিক উন্নয়ন সুসংহত হয়।

অন্যান্য সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের মতো বাংলাদেশেও স্বাধীনতা লাভের পর একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থা রাষ্ট্র গঠন ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে কাজ করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে শুরু করেও ১৯৯১ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক সরকারের সময়কালে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার যথাযথ কার্যকারিতা প্রস্ফুটিত হয়নি। কখনো কখনো শক্তিশালী বিরোধী দলের অভাব আবার কখনো সরকারি দলের ব্যাপক আধিপত্য রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে। শুধু তাই নয় উক্ত সময়ে বাংলাদেশে অগ্রযাত্রা ভীষণভাবে ব্যাহত হয়ে সামরিক শাসনের কবলে পতিত হয়। দীর্ঘ ৮ বছর সামরিক আইনের দ্বারা রাজনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনার পর এরশাদের পদত্যাগ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এটা ছিল গণতন্ত্র

ও সাংবিধানিক আইনের বিজয়। এরশাদের পদত্যাগের পর সাহাবুদ্দিন আহমদের নের্তৃত্বে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। সাহাবুদ্দিন আহমদের নের্তৃত্বাধীন নির্দলীয় সরকার ৯০ দিনের মধ্যে একটি সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করতে সমর্থ হয়। দেশীয় ও আন্ড়র্জাতিক পর্যবেক্ষক মহল বাংলাদেশের এই নির্বাচনকে পূর্বের তুলনায় খুবই সুষ্ঠু হয়েছে বলে মন্ড়ব্য করেন। এই নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং জামায়াত ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে। সরকার গঠনের পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে মতভেদ দেখা দেয়। বিএনপি'র গঠনতন্ত্র অনুসারে নির্বাচনী প্রচারণার সময়ও খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির পক্ষে ছিলেন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ সংসদীয় সরকার পদ্ধতির পক্ষে ছিল। নির্বাচনের পর খালেদা জিয়া অন্যান্য রাজনৈতিক দলের দাবির প্রেক্ষিতে তার মনোভাব পরিবর্তন করেন। এসময় বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয়েই মিলিতভাবে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সাংবিধানিক সংশোধনী পাস করে। খালেদা জিয়ার প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল প্রতিশ্রুত সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা। প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে যে গঠনমূলক প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় তা খালেদা জিয়ার শাসনের দুই বছরের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ইস্যু নিয়ে প্রধান বির্তক সৃষ্টি হয়। দুই দলের মধ্যে পৌরসভা ও উপ-নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রায়ই সহিংস তৎপরতা দেখা দেয়। ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে বিএনপি'র অধীনে প্রতারণাপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত মাগুরার উপ-নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় সরকারের অধীনে একটি সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের দাবি করে।[২৩] বিএনপি এই দাবিকে সংবিধান পরিপন্থি বলে ঘোষনা করে। ফলে আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জন শুরু করে এবং পরবর্তী দুই বছর সংসদের বাইরে বিভিন্নভাবে আন্দোলন করতে থাকে। সংসদের অন্য দুটি দল জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী ও আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। এসময় আওয়ামী লীগ পুনঃপুন ধর্মঘট ডাকলে দেশ অচল হয়ে যায়। এক পর্যায়ে ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলগুলোর সংসদ বর্জন করে। এ অবস্থা চলতে থাকলে খালেদা জিয়া ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদ ভেঙ্গে দেয় এবং পরবর্তী সংসদ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেন, বিএনপি'র অধীনে এরূপ নির্বাচন বয়কট করে। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির ভোটারবিহীন নির্বাচন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে তীব্র সমস্যা সৃষ্টি করে। সরকার নিপুণনতার সাথে নির্বাচনের ফলাফলের বৈধতা দিলে আওয়ামী লীগ অভিযোগ করে যে বিএনপি সত্যিকার অর্থে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ড় সুশীল সমাজ এবং এমনকি বেসামরিক আমলারা পর্যন্ড় বেরিয়ে আসে একটি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের পক্ষে। খালেদা জিয়ার এই দাবি না মেনে কোন উপায় ছিল না। অতঃপর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের রাজনীতির মাধ্যমে গঠিত সংসদের একমাত্র অধিবেশনে সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান করা হয়।[২৪] সংসদ আবারও ভেঙে যায়; খালেদা জিয়া পদত্যাগ করে এবং নির্দলীয় সরকারের প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের কাছে

ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়র করেন। এই সমস্যা থেকে উত্তরণ ঘটলে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা উভয়েই তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে বিজয় অর্জন হয়েছে বলে মনে করেন। বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ৯০ দিনের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে সমর্থ হয়। দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকরা এই নির্বাচনটিকেও অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলে অভিমত প্রকাশ করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে। যদিও বিএনপি ভোট কারচুপির অভিযোগ করে তথাপি নির্বাচনের ফলাফল মেনে নেয় এবং আওয়ামী লীগের কাছে সহজে ক্ষমতা হস্ড়ান্ড়র করে।[২৫] আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক উন্নয়ন সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সবসময় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। বিএনপি বার বার সংসদ অধিবেশ বয়কট করতে থাকে এবং রাজপথে নেমে আসে ও দিনের পর দিন ধর্মঘট দিয়ে দেশ অচল করে দেয়। আওয়ামী লীগের মত বিএনপিও উপ-নির্বাচন ও বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে; সকল স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনী নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং আওয়ামী লীগ সরকারের পদত্যাগ দাবী করে। আবার রাজনৈতিক সমস্যা দেখা দেয়, দুটি প্রধান দলের মধ্যে সংঘর্ষ পুণরায় উদ্বেগ সৃষ্টি করে। যাহোক আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদ শেষ হওযার পর পুণরায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে দেশে অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে। এই নির্বাচনটিও অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় বলে দেশী ও বেদেশী পর্যবেক্ষকরা অভিমত প্রকাশ করে। যদিও আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে কারচুপির অভিযোগ করে। সরকার গঠনের পর থেকেই সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলের মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস এবং রাজনীতিকগণের নিজস্ব দলীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়ায় তারা সংসদ প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে ব্যর্থ হয়। দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক সংকট এবং অচলাবস্থা রাজনৈতিক দলসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি অত্যন্ড় দুর্বলতা প্রমান করে। এই সীমাবদ্ধতার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সাংবিধানিক রাজনীতির অভাব, ব্যক্তিগত আনুগত্য, পরস্পর অবিশ্বাস, প্রভু-অধস্ড়ন সম্পর্ক,সন্ত্রাস, রাজনৈতিক দলসমূহের গণতন্ত্রচর্চার অভাব ইত্যাদিকে দায়ী করা চলে।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সাফল্যমন্ডিত করার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা । সাধারণভাবে আইনের শাসন বলতে বোঝায় শাসক ও শাসিত একই আইনের অধীনে থাকবে। শাসকের জন্য আলাদা কোন আইন থাকবে না। আইনের শাসন কথাটির সর্বপ্রথম নিয়মমাফিক একটি ব্যাখ্যা দেন A.V. Dicey। আইনের শাসন বলতে তিনি তিনটি উপাদানকে বুঝিয়েছেন-(১) স্বৈরীক্ষমতার অনুপস্থিতি (Absences of arbitary power) (২) আইনের চোখে সমতা (Equity before law) (৩) নাগরিক অধিকার (Citizens'right)।[২৬] A.V. Dicey যে তিনটি বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। দেশের সাধারন আইনের প্রাধান্য, স্বৈরীক্ষমতার অনুপস্থিতি ও নাগরিকের অধিকারসমূহের আইনগত নিশ্চয়তাদান তা পৃথিবীব্যাপী স্বীকৃত।

আইনের শাসনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Sir Ivor Jennings বলেন " প্রকৃত অর্থে আইনের শাসন বলতে এমন একটি গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা তথা সাংবিধানিক সরকারকে বোঝায় যে, সরকার ব্যবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা শুধু অনুমোদিত (Permissible) নয় বরং একটি উত্তম গুণ (A positive marit) ; শুধু গ্রহণযোগ্য (Allowed) নয় বরং উৎসাহিত করা হয়। যেখানে এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে সেখানে আইনের শাসনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য আপনাআপনি নির্গত হয়।[২৭]

সুতরাং আইনের শাসন বলতে বোঝায়, শাসক ও শাসিত উভয়েই আইনের অধীন হবে। শাসন ব্যবস্থা শাসকের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও শাসনের ভিত্তি হবে আইন, যে আইনটি হবে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ যে আইনের ভিত্তি জনগণের পূর্ণ সম্মতি।

বাংলাদেশের সংবিধানে আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য কতিপয় বিধান সংযোজিত রয়েছে। সংবিধানের প্রস্ভাবনায় বলা হয়েছে "..... আমাদের রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা- যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।[২৮] সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।[২৯] ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহারলাভ যে কোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।[৩০] সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ১৮টি মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত করা হয়েছে এবং ৪৪ অনুচ্ছেদ ও ১০২ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে এগুলো বলবৎকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৭ ও ২৬ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে আইন বিভাগের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছে। যাতে আইনসভা সংবিধান ও মৌলিক আইন পরিপন্থী কোন আইন পাস করতে না পারে। ৭, ২৬ ও ১০২ (২) অনুচ্ছেদ সুপ্রীমকোর্টের বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা দিয়েছে। সুতরাং আইন বিভাগ ও নির্বাহী বিভাগ তাদের সীমা লঙ্ঘন করলে সুপ্রীম কোর্ট তাদের কাজকে অবৈধ ঘোষনা করতে পারে।

বাংলাদেশের সংবিধানের এই বিধানসমূহ আইনের শাসন নিশ্চিতকরণের জন্য উপযোগী হলেও সংবিধান আইনের বিরোধী কিছু বিধান পরিলক্ষিত হয়।

আইনের শাসন নিশ্চিত করার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি হলো একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ। শুধু নিয়োগ পদ্ধতির বিধান ব্যতীত সুপ্রীম কোর্টের স্বাধীনতা সংবিধানে ভালভাবে নিশ্চিত করা হলেও নিম্ন আদালতে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়নি। কারণ নিম্ন আদালতের বিচাকরদের নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে নির্বাহী বিভাগের হাতে ন্যস্ড় করা হয়েছে; ম্যাজিস্ট্রেটগণ একই সাথে বিচার বিভাগীয় ও নির্বাহী উভয় ক্ষমতা প্রয়োগ করছে। ফলে তাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে বিচার করা সম্ভবপর হচ্ছে না। সুতরাং ২৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আইনের চোখে সমতা নিশ্চিত হতে পারছে না। বাংলাদেশের রাজনৈতিক

অবস্থা বিশেণ্ডষণ করলে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ড় কোন সরকারই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেনি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম মূল উপাদান হলো একটি গণতান্ত্রিক সরকার বা সাংবিধানিক সরকার। যেহেতু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম উপাদান গণতান্ত্রিক সরকার বা সাংবিধানিক সরকার সুতরাং সামরিক শাসনের অধীনে কখনোই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হতে পারে না। ১৯৯০ সালে এরশাদের পতনের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তন হলে দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করে। কিন্তু এ যাবত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তিনবার সরকার গঠিত হলেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন সরকারই উলেণ্ডখযোগ্য ভূমিকা রাখেনি। বিএনপি ও আওয়ামী লীগ সরকার পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় এসে তাদের আর্ম ক্যাডার ব্যবহার করেছে; নির্বতনমূলক আটক আইন বাতিল না করে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের ওপর ব্যবহার করেছে নির্বিচারে। আওয়ামী লীগ সরকার জননিরাপত্তা আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের ওপর নির্যাতন করেছে এবং বর্তমানে জোট সরকার সন্ত্রাস দমন আইনের অপপ্রয়োগ ঘটিয়ে অপরাধীদের আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে হত্যা করছে। এই আইনসমূহ যে অসংখ্য মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে বা করছে এবং বহু লোকের জন্য হয়রানির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা বাধাগ্রস্ড় হয়েছে বা হচ্ছে। বস্তুত এদেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সরকারগুলো শুধু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতেই ব্যর্থ হয়নি, তারা Law and Order কে সঠিকভাবে পরিচালনা করতেও ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও সঠিকভাবে পরিচালনা করা যেকোন গণতান্ত্রিক সরকারেরই প্রধান কাজ যা রাজনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।[৩১]

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার আরেকটি অন্যতম মূল উপাদান স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা। বিগত গণতান্ত্রিক সরকারগুলো বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের কথা বললেও আজ পর্যন্ড় কার্যকর অর্থে স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেনি।[৩২] তাছাড়া সরকারি ও বিরোধীদলগুলো দ্বারা আদালতের মামলা পরিচালনায় বিঘ্ন সৃষ্টি, মামলার রায় প্রদানের জন্য আইনজীবী কর্তৃক বিচারককে প্রভাবিতকরণ, বিচারকদের প্রভাবিত করার জন্য আদালতের বাইরে কর্মীদের বিক্ষোভ, বিচারকদের রায়ের বিরুদ্ধে আইনজীবীদের প্রস্ড়াব গ্রহণ, বিচারকের চাকুরী ও প্রাণনাশের হুমকি ইত্যাদি ধরনের অশুভ তৎপরতা শুরু করা হচ্ছে, যা আইনের শাসনের পরিপন্থী।[৩৩]

সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদ হলো আলাপ-আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অর্থবহ করে রাজনৈতিক উন্নয়ন সাধনের জন্য একটি কার্যকরী সংসদ আবশ্যক। কিন্তু দেখা যায়, ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তনের পরে তৎকালীন বিরোধী দল আওয়ামী লীগ বিভিন্ন ইস্যুতে সংসদ বর্জন করতে থাকে এবং ১৯৯৪ সালে সংসদ থেকে পদত্যাগ করে। একইভাবে ১৯৯৬ সালের আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে বিরোধী দল বিএনপি সংসদ বর্জন করে। আবার ২০০১ বিএনপির নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর

বিরোধীদল আওয়ামী লীগ সংসদ বর্জন করে। বিরোধী দলের ক্রমাগত সংসদ বর্জনের ফলে সংসদের কার্যকারিতা ব্যহত হয়েছে যা রাজনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

সুতরাং দেখা যায় যে স্বাধীনতা পরবর্তী কালে কোন সরকারই রাজনৈতিক উন্নয়নকে সুসংহত করার জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার ক্ষেত্রে উলেখযোগ্য কোন ভূমিকা পালন করেনি। বরং ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকার্যকর করেছে। ফলে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে; রাজনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে হুমকির সম্মুখীন। তাই বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের ভগ্নদশা থেকে মুক্ত করে প্রাতিষ্ঠানিক গণতন্ত্রে পরিণত করতে হলে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা একান্ত আবশ্যক।

জবাবদিহিমূলক স্বচ্ছ সরকার ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক উন্নয়ন

গণতন্ত্রকে সুসংহত করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য জবাবদিহিমূলক স্বচ্ছ সরকার ব্যবস্থা অত্যন্ত আবশ্যক। আর জবাবদিহিমূলক স্বচ্ছ সরকার ব্যবস্থার অন্যতম পূর্ব শর্ত গণমাধ্যমের স্বাধীনতা। কিন্তু একথা সত্য যে গণমাধ্যম অনেক সময় দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করে না । উপরন্তু সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করলে দেখা যায়, আমাদের দেশে সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের মান ও স্তর এখন পর্যন্ত দুর্বল ও অপর্যাপ্ত। সংবাদ বুদ্ধিবৃত্তিমূলক উদ্দেশ্য গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যকর প্রবৃদ্ধির মানের তুলনায় নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। যাহোক সমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে জবাবদিহিমূলক স্বচ্ছ সরকার ব্যবস্থা তথা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দেশের অর্থনীতির বিকাশ এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় তা মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। আর সেজন্য প্রয়োজন গণমাধ্যমের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেওয়া।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর প্রাথমিক পর্যায়ে গণমাধ্যমগুলোর স্বাধীনতা থাকলেও অল্প দিনের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার এর ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। তবে চতুর্থ সংশোধনীর পর কঠোরভাবে প্রেসের ওপর সেন্সরশীপ আরোপ করা হয় এবং সংবাদপত্রগুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার অধীনে আনা হয়। এ সময় দুটি ইংরেজী এবং দুটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়া সব দৈনিক পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়। জিয়াউর রহমানের শাসনামলেও গণমাধ্যমগুলোকে সরকারি নিয়ন্ত্রনাধীনে রাখা হয়। এসময় সংবাদপত্রগুলো সামরিক শাসক জিয়ার বিরুদ্ধে তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা করতে পারত না। একইভাবে এরশাদও তার কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে লেখার জন্য জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় । *দৈনিক দেশ*, *খবর*, *ইনকিলাব* এবং *বাংলার বানী* বেশ কয়েক মাসের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। *বাংলার বাণী* বন্ধ ছিল প্রায় চৌদ্দ মাস। একইভাবে *সাপ্তাহিক যায়যায় দিন*, *রোববার* ও *খবর* বন্ধ করে দেওয়া হয়। রেডিও ও টেলিভিশন সব সময়েই কেবল সরকারের প্রশস্তি বিস্তারের জন্য একচেটিয়া ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালে দেশে পুণরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে গণতান্ত্রিক সরকারও গণমাধ্যমের পুরোপুরি স্বাধীনতা দেয়নি। বর্তমানে গণতন্ত্রিক

সময়েও গণমাধ্যম পুরোপুরি স্বাধীন নয়। মুদ্রণ মাধ্যমকে ছাড় দিলেও সরকার ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমকে কুক্ষিগত করে রেখেছে।[৩৪] গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যেকোন সংবিধি আদেশের দ্বারা গণমাধ্যমের গতি রোধ করলে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে তা সংবাদ মাধ্যমের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশ টেলিভিশন আর গণমানুষের সম্প্রচার মাধ্যমের প্রতিনিধিত্ব করে না। সরকারি এই প্রতিষ্ঠানটিকে নষ্ট করে ফেলেছে ক্ষমতাশীন সরকারগুলোই। বর্তমানেও এর ধারবাহিকতা অক্ষুণ্ন রয়েছে।

সুতরাং বলা যায় গণমাধ্যমের একটি বড় অংশকে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ভূমিকা পালন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে যা রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে তথা জবাবদিহিমূলক স্বচ্ছ সরকার ব্যবস্থার পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

সুশীল সমাজের ভূমিকা ও রাজনৈতিক উন্নয়ন

পাকিস্তানী ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে, আর সব মহতী আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল একটি সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা করা । কেননা সিভিল বা নাগরিক সমাজই প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের বোধ, কল্পনা এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারণাকে লালন, পুষ্ট ও ক্রমান্বয়ে প্রসারিত করে। সত্যিকারের রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র ও সরকারের সকল সিদ্ধান্তে সিভিল সোসাইটি বা সাধারণসমাজের বিভিন্ন অংশসমূহের প্রত্যক্ষ ও কার্যকর অংশিদারিত্বের মাধ্যমে জনগণের পক্ষে সাধারণ সমাজ ক্ষমতা প্রয়োগ এবং সরকার ও রাষ্ট্র যন্ত্রের সকল অসাংবিধানিক বা স্বেচ্ছাচারমূলক সিদ্ধান্তসমূহ সাধারণ সমাজের পক্ষে কার্যকরভাবে প্রতিরোধ বা প্রত্যাখান করতে সক্ষম হয়।[৩৫]

Civil Society শব্দটি সপ্তাদশ শতাব্দীর দার্শনিক টমাস হবসের লেখায় প্রথম প্রকাশ পায়। আভিধানিকভাবে Civil শব্দটির অর্থ সত্য অথবা ভদ্র এবং Society অর্থ সমাজ। Civil Society এর আভিধানিক বাংলা প্রতিশব্দ এর রূপকে যথাযথভাবে ব্যক্ত না করলেও সমার্থক শব্দ সাধারণ সমাজ বা নাগরিক সমাজ ব্যবহারের মাধ্যমে এর ধারণাকে আরো স্পষ্টতর করা যেতে পারে। সাধারণ অর্থে সিভিল সোসাইটি বা সাধারণ সমাজ বলতে বোঝায়, সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে সাধারণ সমাজ সক্রিয় প্রগতিশীল শক্তিরূপে কার্যকর ভূমিকা রাখে এবং গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মানের বহু তত্ত্বের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে এমন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন। ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র আন্দোলন, গণমাধ্যম,সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, নারী আন্দোলন, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বা এনজিও এবং সংগঠন প্রয়াসী শ্রমজীবী ও নারী-এরাই মূলত সিভিল সমাজের সংগঠিত ও অসংগঠিত অংশ। রাষ্ট্র এবং সমাজের শক্তিশালী ও সংগঠিত সিভিল সমাজ বা নাগরিক সমাজের কার্যকর উপস্থিতি প্রকৃত ও অর্থবহ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে তরান্বিত করে।[৩৬] সিভিল সমজের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনসমূহ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল বা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে চায় না। কাজেই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক অধিকার

আদায়ের আন্দোলন তারা আপোষহীন থাকে। রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল এবং কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহল যখন ক্ষমতা গ্রহণ ক্ষমতা ও সম্পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নাগরিক জীবনে উপর্যুপরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিখার তথা গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে তোলে, তখন সিভিল সমাজ অব্যাহত প্রতিবাদ আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপের বিপরীতে সর্বদা ক্রিয়াশীল থাকে। তাই এটা নিশ্চিত করে বলা চলে, রাষ্ট্র ও সমাজে একটি সমন্বিত, সংগঠিত, সচেতন এবং আপোষহীন সিভিল সমাজের উপস্থিতি অপরিহার্য।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য ১৯৭২ সালে যে সংবিধান প্রণীত হয় তা ছিল আধুনিক, গণতান্ত্রিক , পরিচ্ছন্ন ও ধর্ম নিরেপক্ষ স্বাধীনতাকামী গণমানুষের অধিকার ও আকাঙ্ক্ষার অভিপ্রায়ের মূর্তরূপ সেখানে প্রতিফলিত হয়েছিল যথাযথভাবে। আশা আকাঙ্ক্ষা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার বাস্তবায়ন ও সংরক্ষণের সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনায় এটিকে পরিণত করেছিল অমূল্য দলিলে। এই সংবিধান রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত সিভিল সমাজ গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। কেননা এই সাধারণ সমাজের ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই একটি সর্বস্তরের জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব এবং এ ধরনের ক্ষমতায়নই রাষ্ট্রকে দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর সর্বাধিক কল্যাণ ও উন্নয়নকল্পে নিয়োজিত করতে পারে। রাষ্ট্র পরিচালনায় সাধারণের ভূমিকা বা প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্বের ধারণাই মূলত গণতন্ত্রের ধারনা। তাই সাধারণ সমাজের ক্ষমতায়নই সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিকাশকে নিশ্চিত ও নিরাপদ করে যা অবশ্যই রাজনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

সত্যিকার অর্থে ১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সামরিক গোষ্ঠীই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসন করেছে এবং সংবিধানে বারবার সংশোধনী এনে রক্তাক্ত ও বিপন্ন করে তুলেছে এবং এর মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, লক্ষ্য ও অভিষ্ঠকে ভূলুণ্ঠিত করা হয়েছে চরমভাবে। চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ উৎসারিত সিভিল সামজবোধ যার ভিত্তিমূল হচ্ছে নাগরিকতা এবং সিভিল অধিকার প্রতিষ্ঠা। যদিও স্বৈরাচার পতনের পর একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতাসীন হয় এবং দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে আবার সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রবর্তিত হয়, তথাপি সামরিক শাসকদের সৃষ্ট বিকৃত রাজনৈতিক ধারা এবং তাদের প্রয়োগকৃত রাষ্ট্র ও জাতির কল্যাণ ও স্বার্থ বিরোধী দূরভিসন্ধিমূলক বিভিন্ন কলাকৌশল বাংলাদেশেল পূর্নাঙ্গ রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি স্থায়ী সমস্যা হিসেবে থেকে গেছে। ফলে বাংলাদেশে এখনও সিভিল সমাজ সে রকমভাবে গড়ে ওঠেনি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের শর্তসমূহ বিশেণ্ডষণ করলে দেখা যায় যে স্বাধীনতা লাভের ৩৯ বছরেও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি। প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রাথমিক অবস্থায় বেশ কিছু সংকটের সনমূখীন হয় অভ্যন্তরীন রাজনৈতিক উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে তোলে।[৩৭] যদি নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ এই প্রাথমিক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে তবে গণতন্ত্রের সূচনালগ্নে 'উন্নয়ন

বিরোধী' কর্মকান্ড আরম্ভ হয়।[৩৮] দীর্ঘদিনের উপনিবেশিক শাসন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী কর্তৃত্ববাদী শাসনের কারণে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নে বেশ কিছু সমস্যা দৃষ্ট হয়।

মূল্যায়নঃ

সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায় রাজনৈতিক উন্নয়নের অপরিহার্য শর্তসমূহ অর্থাৎ অংশগ্রহণমূলক নাগরিক সমাজ সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা এবং স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক সরকার ব্যবস্থা প্রভৃতির কোনটিই যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু কার্যকারিতা ও ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্মাণ তথা রাজনৈতিক উন্নয়ন তখনই সম্ভবপর হয় যখন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলো সার্বিকভাবে বিকশিত হয় ও তৎপর থাকে। এভাবে সমাজে ক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সমষ্ঠি যখন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে তখন তাদের প্রতিষ্ঠানিকীকায়ণ সম্ভবপর হয়। আর এভাবেই একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন সম্ভবপর হয়। কিন্তু বাংলাদেশ এসকল ব্যবস্থার সফলতা ও কার্যকারিতার অভিজ্ঞতা নেই এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকীকায়ণের অভাব পরিলক্ষিত হয় এর ফলে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ও প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে যা রাজনৈতিক উন্নয়নের পথে মূখ্য বাধা হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ অভুদয়ের পর সুদীর্ঘ ৩৯ বছর আতবাহিত হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত দেশটি রাজনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় উপদান সাফল্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়নি। এ অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ এখন একটি সংকটময় সময় অতিবাহিত করছে। যদিও দেশের সামগ্রিক অবস্থা, যেমন: অর্থনৈতিক মাত্রা, বিজয়ের ইতিহাস, সাস্কৃতিক ঐহিত্য, সাধারণ মানুষের মনে আলোর সঞ্চার করে চলেছে। বস্তুত রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য যা দরকার তাহলো গতিশীল পরিবর্তন এবং নতুন মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতৈক্য এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের উপর জোর দেয়া। বর্তমানে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক মাত্রা, স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, কার্যকরী সুশাসন এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনেক বাধার সম্মূখীন হচ্ছে কিন্তু খুব কম সময়ে এ সমস্যা অতিক্রম করা যাবে না। একটি টেকসই সংস্কার ও পরিবর্তন প্রক্রিয়াই কেবল রাজনৈতিক দল ও তার নেতৃবৃন্দকে নতুন ভাবনা, পদক্ষেপ ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সাহায্য করতে পারে যা একটি দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে তরান্বিত করার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র বিকাশের পথে দেশের ২টি বড় দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্ব সংঘাত নিরসণ করে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো বাস্তবায়ন করা দরকার। যথা: ১. প্রশাসনিক সংস্কার, ২. বিচারব্যবস্থা ও আইন শৃংখলা বাহিনীর উন্নয়ন সাধন, ৩. সংবাদপত্র ও সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতা

নিশ্চিতকরণ, ৪. জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবস্থাপনা, ৫. জেন্ডার সমতা, ধর্মীয় বন্ধন এবং তথ্য প্রযুক্তির ওপর জোর দিয়ে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করণ, ৬. সমাজের সকল স্তরে সচেতনতা সৃষ্টি, ৭. সমাজের পশ্চাতপদ গোষ্ঠী ও নারী উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, ৮. দুর্নীতি দূরীকরণ, ৯. সরকারের সকল স্তরের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ এবং ১০. আমলাদের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।

তথ্যনির্দেশ

১ A.F.K. Organski, *The Stages of Political Development* (New York: KNOPF, 1956) pp. 3-17.

২ Lucian W. Pye, *Aspect of Political Development* (Boston: Little Brown and Company, 1967), pp. 45-48

৩ Seymor Martin Lipset, "Some Social Requisites of Democracy". *American Political Science Review:* March 1959, pp.69-105.

৪ Lucian W. Pye*, Op.cit.* pp. 77-88.

৫ Gabriel A. Almond and Bingham Powell Jr., *Comparative Politics: A Developmental Approach*, (Boston: Little Brown, 1966) p. 105.

৬ *Ibid,* p.105.

৭ J.C Johari, Comparative Politics, (New Delhi: Sterling Publishers Private Ltd., 1996). p. 175.

৮ এ কমিটি প্রায় দশ বছর ধরে বিভিন্ন ক্ষেত্রেক গবেষণা পরিচালনা করে এ সম্মর্কে মূল্যবান অবদান সংযোজন করে। বিস্ড়ারিত তথ্যের জন্য দেখুন, J.C Johari, *op. cit.* pp. 173-174.

৯ Claude E. welch (ed.), Political Modernization (Words Worth Publishing Company, Inc. 1977). pp.1- 23

১০ David E. Apter, *Rethinking Development: Modernization Depenalenuy and Postmodern Polity*, (Stage Pablication, 1987). p.18

১১ J. C. Johari, Comparative Politics(New Delhi: Sterling Publishers Private Ltd., 1996), p.175

১২ Enayetur Rahim, "Electoral Politics in Bangladesh" in Rafiuddin Ahmed (ed.), *Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh* (New Delhi: South Asian Publishers, 1990), p.107

১৩ Fakhruddin Ahmed, *The Caretakers: A First Hand Account of The Interim Government of Bangladesh (190-91)* (Dhaka: The University Press Limited, 1998),

১৪ *Ibid.*

১৫ ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি: সংঘাত ও পরিবর্তন* (রাজশাহী: রা.বি পাঠ্যপুস্ড়ক প্রকাশনা বোর্ড,১৯৯৪), পৃ.৩৬৫

১৬ S. Aminul Islam, " The Predicament of Democratic Consolidation in Bangladesh"; *Bangladesh e-Journal of Sociology*,p.10 *(http:/*www.bangladeshsociology.org),

১৭ Report on Observation of 12 June 1996 Polls, *FEMA,* Dhaka, 30 July 1996, pp.10-11

১৮ Al Masud Hasanuzzaman, Role of Opposition in Bangladesh Politics (Dhaka: The University Press Limited, 1994), p.208

১৯ Waresul Karim, *Election Under a Caretaker Government* (Dhaka: The University Press Limited, 2004), pp.8-19

২০ J. H. Corry and J. E. Hodgetts, *Democratic Government and Politics* (Tronto: Tronto University Press, 1968), p.23; R. M. Maclver, *The Modern State* (London: Oxford University Press, 1964), p. 399

২১ ড. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি* (রংপুর: টাউন স্টোর্স, ১৯৯৮), পৃ. ৩২৪

২২ মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর, *গণতন্ত্র* (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৫), পৃ.৮৮

২৩ Al Masud Hasanuzzaman, *Op.cit.* p.104

২৪ I Kundu and N. Saha, "Democracy-Development Debate in Bangladesh: An Analysis of Some Relevant Issues." *Chittagong University Journal of Law*, 2001, pp.170-71

২৫ M. Abdul Mannan, *Election and Democracy in Bangladesh* (Dhaka: Academic Press and Publishers Library, 2005), pp. 160-61

২৬ A. V. Dicey, *An Introduction of the Study of the Law of the Constitution* (London: Mcmillan Education, 10th Edition, 1959), pp. 188-204

২৭ Sir Ivor Jennings, *The Law and the Constitution* (London: The English Language Society and Hodder and Stoghton, 5th Edition, 1976), pp.60-61

২৮ *The Constitution of the Peoples Republic of Bangladesh,* (As modified up to 31st December 1998), p.1

২৯ *Ibid.* p.39

৩০ *Ibid.* p.9

৩১ Rounaq Jahan, "Political Development" See A. M. Choudhury and Fakrul Alam (ed.), *Bangladesh On the Threshhold of the Twenty-first Century* (Dhaka: Asiatic Society of Bangldesh,2002), p.57

৩২ Rounaq Jahan, "The Challenge of Institutionalizing Democracy in Bangladesh" *ISAS Working Paper* (Tower Block: Institute of South Asian Studies, national University of Singapore), p.20 (www.isas.nus.edu.eg).

৩৩ Moudud Ahmed, *Democracy and the Challenge of Development* (Dhaka: The University Press Limited, 1995), p.378

৩৪ Rounaq Jahan, *Bangladesh Promise and Performance* (Dhaka: The University Press Limited, 2000), p.22

৩৫ Rehman Sobhan, "Building a Responsible Civil Society: Challenges and Prospects" in Rounaq Jahan, *Op.cit.*,p.348

৩৬ Harry Blair, "Civil Society, Democratic-Development and International Donors" in Rounaq Jahan, *Bangladesh Promise and Performance,* Op.cit. pp.183-84